

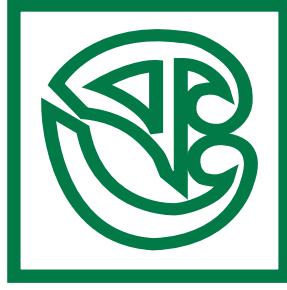
বৌদ্ধধর্ম ও পারমীপূর্ণ আর্য্য পুরুষ
সাধনানন্দ শ্রমণের (বনভন্তের)
সাধনা ও ধর্মদেশনা



লেখক :

শান্তিভূষণ চাকমা

সাং- মাঝেরবস্তি, ডাকঘর- রাঙ্গামাটি
জেলা- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ।



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকাশ

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

বৌদ্ধধর্ম ও পারমীপূর্ণ আর্য্যপুরুষ
সাধনানন্দ শ্রমণের (বনভন্তের)
সাধনা ও ধর্মদেশনা



প্রণীত :

শান্তিভূষণ চাকমা

সাং- মাঝেরবস্তি, ডাকঘর- রাঙ্গামাটি
জেলা- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ।

বৌদ্ধধর্ম ও পারমীপূর্ণ আর্য্যপুরুষ
সাধনানন্দ শ্রমণের (বনভন্তের) সাধনা ও ধর্মদেশনা

প্রকাশনায়

: শান্তি ভূষণ চাকমা
গ্রাম- মাঝেরবস্তী
থানা- কতোয়ালী
জেলা- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

প্রাপ্তি স্থান

: রাসেল ষ্টোরস
বনরূপা, রাঙ্গামাটি

কম্পিউটার কম্পোজ, ডিজাইন ও মুদ্রণে: সীবলী অফসেট প্রেস
কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

গুণেচ্ছা মূল্য

: ৩৫ (পয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমি আমার পরলোকগত

পিতা-মাতার

সৎগতি কামনা করে

এই বইটি

উৎসর্গ করিলাম

- লেখক

সূচীপত্র

● বৌদ্ধধর্ম ও পারমীপূর্ণ আৰ্য্য পুরুষ- সাধনানন্দ শ্রমণের (বনভন্তে) সাধনা ও ধর্মদেশনা	৫
১) শীলস্কন্ধপূর্ণ করার সাধনা- আদি কল্যাণ	৭
২) সমাধিস্কন্ধ পূরণের সাধনা- মধ্য কল্যাণ	১২
৩) প্রজ্ঞা স্বক্ক পূরণের সাধনা- অন্তে কল্যাণ	১৫
৪) শ্রমণ সাধনানন্দের অহর্ভু মাগফল লাভ	১৯
৫) বনভন্তের ধর্মদেশনা	২০
৬) দানোত্তম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান উৎপত্তির বিবরণ	২১
৭) রাজ বনবিহারকে নিয়ে কিছু ভাবনা	২৪

বৌদ্ধ ধর্ম ও পারমীপূর্ণ আর্য্যপুরুষ সাধনানন্দ শ্রমণের (বনভন্তের) সাধনা ও ধর্মদেশনা অবতারণা

প্রাচীন ভারত : গৌতম বুদ্ধের সময়ে ১৬টি বৌদ্ধরাষ্ট্র ছিল। এগুলো হলো অঙ্গ, মগধ, কাশী, কৌশল, বজ্জী, মল্ল, চেত্তী বৎস, কুরু, পাঞ্চল, মচ্ছ, সুরসেল, অস্সক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ। এদের মধ্যে শাক্য রাজ্যের নাম পাওয়া যায় না তার কারণ শাক্য রাজ্য ছিল কৌশল রাজ্যের অধীন এক ছোট জনপদ। এই ছোট জনপদের শাসককে বলা হয় রাজা আর ১৬টি রাজ্যের শাসককে বলা হয় মহারাজা। রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন কপিলাবস্তু নামীয় ছোট এক জনপদের রাজা আর তাঁরই পুত্র হলেন গৌতম, যিনি আপন সাধনা বলে নিজেকে ভগবান অর্হৎ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ নামে অভিহিত করে, বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন ও প্রচার করিয়াছেন এবং সর্ব জীবের কল্যাণ ও মানবের দুঃখ মুক্তি নির্বাণের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম অতি দ্রুত গতিতে বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড ও মানুষের হৃদয় জয় করে তার কারণ, এই ধর্মে হিংসা, বিদ্বেষ বলে কিছু নেই, মৈত্রীতে পরিপূর্ণ। এই ধর্ম অনাবিল বিশ্বের সকল প্রাণীর হিত, সুখ ও দুঃখ মুক্তি কামনা করে, এজন্য বৌদ্ধযুগে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ভারতবর্ষে খৃষ্ট পূর্ব ছয়শতক হতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও প্রসার ঘটে। পঞ্চাশতাব্দে বারশতক হতে হিন্দু, মুসলিম, আজ্ঞাচক্র তথা রাজশক্তি এই পবিত্র ধর্মকে ভারতভূমি হতে বিলোপ সাধন করতে থাকে এবং সর্বশেষ বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ সম্রাজ্যবাদ মূল ভারত হতে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ সাধন করে তবে ভারতের দক্ষিণ পূর্বপ্রান্তে মায়ানমার (বার্মা) সীমান্তবর্তী অঞ্চল চট্টগ্রামে সুদূর অতীতে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত চাকমা জাতির এক বীর পুরুষ “বিজয়গিরি” অনেক সংগ্রাম করে এক স্বাধীন চাকমা বৌদ্ধ রাষ্ট্র পত্তন করেন আর এই চাকমা রাজ্যেই এখনো অবধি বৌদ্ধধর্মের প্রদীপ নিবু নিবু ভাবে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে। এই চাকমা জাতির রয়েছে অনেক হাজার বছরের

সুদীর্ঘ ইতিহাস কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই এই জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখেন নাই তবে বিংশ শতাব্দীতে এসে কতিপয় স্বনামধ্যন ব্যক্তি চাকমাজাতির কিছু ইতিহাস লিখে গেছেন।

যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অনেক অনেক মুনি, ঋষি, সাধক পুরুষ জন্মগ্রহণ করে মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করে গেছেন যাদের মধ্যে এক পরমার্থ মানব, মহাসাধক সাধনানন্দ মহাস্থবির অন্যতম। মহাকালের স্রোতে ৮ই জানুয়ারী ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজ্যের তথা সার্কেলের ছোট জনপদ, চাকমা জাতিতে “মোরঘোনা” নামক এক অজানা গ্রাম শ্রী হারু মোহন চাকমা ও শ্রীমতি বীরপদি চাকমার ঘরে এক অনুপম পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তখন শুধু তার পিতা-মাতা নয় চাকমা জাতির মধ্যে কেহ জানে নাই, কেহ বুঝতে পারে নাই তাদের মধ্যে এক পরমার্থ মানব, আর্য্যপুরুষ, মহাসাধক জন্ম গ্রহণ করেছেন। পিতা-মাতা তাদের পুত্র সন্তানের গৃহী নাম রাখলেন রথীন্দ্র লাল চাকমা এবং বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তারা তাকে স্থানীয় মগবান উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন এবং রথীন্দ্র লাল চাকমা যথাক্রমে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন বলে জানা যায়।

যতদূর জানা যায় রথীন্দ্র লাল চাকমা ছিলেন আশৌশব ভাবুক ও শান্ত প্রকৃতির এবং অতীব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি বৌদ্ধ বিহারে যেতেন এবং ধর্ম বই পড়তেন। বৌদ্ধ জাতকের প্রখ্যাত থের ও থেরীদের কাহিনী তাঁকে উল্লাসিত করত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাংসারিক কাজে যোগ দিলেও তাঁর মন-প্রাণ ছিল অসংসারী। তাঁর বয়স যখন ২৯ বছর তখন তিনি ছিলেন অবিবাহিত কুমার। এই সময় রাজ্যমাটিতে তাঁর জীবনের পরম কল্যাণমিত্র জনৈক বাবু গজেন্দ্র লাল বড়ুয়ার... সাথে দেখা পরিচয়। পরিচয় থেকে কল্যাণমিত্র। এই পরম কল্যাণমিত্রই তার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে শ্রামন্যধর্ম গ্রহণ ও আর্য্য সন্ধানের দিকে টেনে নিয়ে যায়। বাবু গজেন্দ্র লাল বড়ুয়া তাকে চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে গিয়ে প্রব্রজ্যা তথা শ্রামণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শ্রীমৎ দীপঙ্কর স্থবির বিহারাদ্যাঙ্ক নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার চট্টগ্রাম তাকে প্রব্রজ্যা দান করেন। শ্রামন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করার পর তিনি তার নামাকরণ করেন সাধনানন্দ শ্রমন।

প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর শ্রমণ সাধনানন্দ তাঁর উপধ্যায়কে তাঁকে শমথ ও বিদর্শন সাধনায় দক্ষ করে তুলতে অনুরোধ করেন। কিন্তু উপধ্যায় তাঁর অপারগতা প্রকাশ করেন। শ্রমণ সাধনানন্দ নন্দন কানন বিহারাধ্যক্ষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারে। তিনি চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারের বিহারাধ্যক্ষকেও শমথ ও বিদর্শন সাধনার শিক্ষা দান করতে অনুরোধ করেন। জবাবে তিনি বলেন বর্তমান সময়ে কেহই তোমাকে এইরূপ শিক্ষাদান করে মুক্তি পথ প্রদর্শন ও অরহত্ব লাভের শিক্ষা দিতে পারবে না কিন্তু শ্রমণ সাধনানন্দ বিন্দুমাত্র হতাশ হলেন না। তিনি দৃঢ় সংকল্প করলেন ধনপাতার গহীন তপোবনে বিদর্শন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে নিজেকে অহর্ভে উন্নীত করবেন।

মহাসাধক সাধনানন্দ শ্রমণের ধনপাতা গহীন তপোবনে অর্হত্ব ও নির্বাণ লাভের সাধনার সুত্রপাত : চিৎমরম বৌদ্ধ বিহারে ২/৩ দিন থাকার পর শ্রমণ সাধনানন্দ চলে এলেন ধনপাতার গহীন অরুণ্যে। তাঁর ছিল না, কোন পর্ণ কুঠির, ছিল না কোন শিক্ষাগুরু, অপর পক্ষে কোন ধর্মগ্রন্থ। তাঁর একমাত্র সম্বল আপন চিন্তের দৃঢ়তা তথা বীর্য চৈতসিক, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

বৌদ্ধশাসনে ইহা বর্ণিত আছে যারা পারমী পূর্ণ মানব তারা ইহ জন্মের প্রচেষ্টা ও পূর্ব পূর্ব জন্মের পারমী হেতু সাধনায় সফলতা লাভ করে থাকেন। যাহা শ্রমণ সাধনানন্দের সাধনার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্ন উঠে না। গৃহী জীবনে বৌদ্ধধর্মের বই পড়ে তিনি যা জেনেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে তিনি সুত্রপাত করলেন সাধনার। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ- তথাগত বুদ্ধের মানবের দুঃখ মুক্তি নির্বাণ লাভের পথ, যাকে সংক্ষেপ করলে হয় শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা। মূলতঃ এই শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাকে ভিত্তি করে শ্রমণ সাধনানন্দের সাধনা যার বিবরণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হইল :-

শীলঙ্কপূর্ণ করার সাধনা- ১৯৪৯ ইং হইতে ১৯৬০ ইং এর জুন পর্যন্ত ধনপাতার কুঞ্জবনে তথা ১০ বছর যাবৎ সম্যক বাক্য সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, শীল ঋদ্ধের সাধনা- আদিকল্যাণ।

কি শীলং, যে নীতি, সত্য ও স্বাশতবাণী সমূহ মানুষকে অসদাচরণ ও অকুশল, কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পাপ কর্ম থেকে বিরত রেখে- সাধনার সর্ব প্রথম স্তর দানশীল ভাবনা- তথা দশ কুশল কর্ম, যথা- দান, শীল, ভাবনা সম্মান, সেবা, ধর্ম শ্রবণ, ধর্মদেশনা, পূণ্যদান, পূণ্য অনুমোদন, সত্যজ্ঞান সঞ্চয় এই পথে পরিচালনা করে তাকেই শীল বলে। শীল মূলতঃ দ্বিবিধ, যথা- চরিত্রশীল এবং বারিত্র শীল। শীল পবিত্র জীবনের ভিত্তি, ইহা মানব জীবনে বয়ে আনে আদি কল্যাণ। শীল বিশুদ্ধি তথা চারিত্রিক বিশুদ্ধিতায় ধর্ম জীবনের ভিত্তি। চরিত্র সুন্দর না হলে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয় না। উপমা দিয়ে বর্ণিত হইয়াছে পতিত জমি আবাদ করে সোনার ফসল ফলাতে হলে যেমন প্রথমে আগাছা তুলে ফেলতে হয়, তেমনি ধ্যান-জ্ঞান লাভ করতে হলে দুশীলতা পরিহার করে চরিত্র বিশোধন এবং পঞ্চ নীবরন দূর করা একান্ত অপরিহার্য।

বুদ্ধের শিক্ষার মূল হচ্ছে, তাঁর শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের গ্রহণ ও শ্রদ্ধার উপর। যেখানে শীলের সৎ নীতির সঙ্গে মানুষের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, সেখানে ধর্ম জীবনের বিকাশ হয় না। বৌদ্ধ ধর্মে কথা ও কাজের মধ্যে অবশ্যই মিল থাকতে হবে। জীবনকে সুপথে পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার প্রয়োজন। বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগের ধর্ম এই সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে না পারলে, ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তির আশা সুদূর পরাহত।

শীল বিশুদ্ধ দ্বারা চারিত্রিক বিশুদ্ধি : উপদিষ্ট হইয়াছে গৃহীকে পঞ্চশীল, উপাসক ও উপসিকাগণকে অষ্টশীল এবং প্রব্রাজিত ভিক্ষুগণকে দশশীল অবশ্যই বিশুদ্ধভাবে পালন করতে হইবে। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাহা হলো- প্রতিমোক্ষ সংবর শীল। এই শীল গৃহী, ভিক্ষু উপাসক-উপাসিকা সকলকে অবশ্যই পালন করতে হইবে। তা না হলে চারি অপায়ে পতন হতে নিজেকে রক্ষা করা কারো পক্ষে সম্ভব নহে। এই কারণে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, গায়ে গৌরিক বস্ত্র, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ এবং দান-ধর্ম সকলি বিফল যদি গৃহী বা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী কায়িক, বাচনিক, মানসিক কর্মে সংযত না হয়। প্রতিমোক্ষ সংবর শীল- বারিত্র ও চারিত্রশীল ভেদে দ্বিবিধ। এইগুলো ছাড়া

উচ্চতর শীল ইন্দ্রিয় সংবর শীল, আজীব পরিশুদ্ধ শীল গৃহীকে চতুপ্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল, বিশুদ্ধভাবে পালন করার জন্য উপদিষ্ট ইহ্যাছে। যে তিন প্রকার পাপ কর্ম তথা চারি প্রকার বাচনিক কর্ম। তিন প্রকার কায়িক কর্ম এবং তিন প্রকার মানসিক কর্ম থেকে বিরত না থাকে গৃহী অথবা ভিক্ষু, ভিক্ষুণীগণকে চারি অপায়ে পতিত হতে হয়। সেই দশ গুরুতর পাপ কর্ম থেকে সংযত বা বিরত থাকার জন্য প্রথমে বারিত্র শীলের বিষয় বর্ণিত হইল-

১। বারিত্র শীল :

ক) চারি প্রকার বাচনিক মহাপাপ : পিতৃন বাক্য, পুরুষ বাক্য, বৃথা বাক্য ও মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত বা সংযত থাকা।

খ) তিন প্রকার কায়িক মহাপাপ : প্রাণী হত্যা, চুরি ও ব্যাভিচার-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, জীবনে এই তিন প্রকার কায়িক কর্ম করবো না।

গ) তিন প্রকার মানসিক মহাপাপ : অভিধ্যা পরের সম্পত্তি লোভ, ব্যাপাদ পরের অহিত চিন্তা, সৎকায় দৃষ্টি, আমিত্বের অহংকার এই দশ কুশল কর্ম থেকে যিনি বিরত ও সংযত থাকেন তিনি প্রধান সংযমী বলিয়া কথিত হয়। এই শীল পালন করার উপরই মানবজীবনে অগ্নি পরীক্ষা।

ঘ) চরিত্র শীল : এই দশ প্রকার কুশল কর্মই ধর্ম জীবনের ভিত্তি যাহা মানব জীবনে বয়ে আনে আদি কল্যাণ। এগুলো হলো- দান, শীল, ভাবনা, সম্মান, সেবা, ধর্ম শ্রবণ, ধর্মাদেশ, পূণ্যদান, পূণ্য অনুমোদন এবং চারিআর্য্য সত্যজ্ঞান সঞ্চয়। চারি আর্য্য সত্য জ্ঞান মানবের দুঃখ মুক্তি, নির্বাণ লাভের পথ।

২। আজীব পরিশুদ্ধ শীল : জীবিকার বিশুদ্ধি- প্রাণী ব্যবসা, মাংস ব্যবসা, বিষ ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা এবং মাদক ব্যবসা এই পঞ্চ ব্যবসা

বৌদ্ধধর্মে নিষিদ্ধ। এই পঞ্চ ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সৎকর্মে পরিবার ভরন-পোষন করাই হচ্ছে আজীব পরিশুদ্ধ শীল পালন।

৩। **ইন্দ্রিয় সংবর শীল :** শীল পালনকারীকে জানা দরকার মানব জীবনে কাম তৃষ্ণা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে দ্বাদশ আয়তন হতে এই তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় যথা- চক্ষুর সঙ্গে রূপের, কর্ণের সঙ্গে শব্দের জিহ্বার সঙ্গে রসের, নাসিকার সঙ্গে গন্ধের, ত্বকের সঙ্গে স্পর্শের এবং মনের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ হলে উৎপন্ন হয় রূপ তৃষ্ণা, শব্দ তৃষ্ণা, গন্ধ তৃষ্ণা, রস তৃষ্ণা, স্পর্শ তৃষ্ণা এবং ধর্ম তৃষ্ণা তথা ষড়বিধ তৃষ্ণা। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক ও মন এগুলো নিজ দেহের ষড়বিধ অন্তরায়তন। আর রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও ধর্ম এগুলো বাহ্যিক ষড়বিধ আয়তন, তথা দ্বাদশ আয়তন।

ভগবান বুদ্ধ একথা বলেছেন মানুষের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হয় নিজের সঙ্গে নিজ চিন্তের যার মর্ম্মমূল হচ্ছে ষড়বিধ তৃষ্ণা। এই ষড়বিধ তৃষ্ণার পেছনে বিশ্বের মানুষ তৃষিত চাতকের মত ধাবমান যাহার কারণেই জন্মচক্র ও ভবচক্র দ্বাদশ নিদানের উৎপত্তি। এই কারণে ভগবান বুদ্ধ মানুষকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংবরশীল কঠোরভাবে পালন করার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছে।

৪। **চারিপ্ৰত্যয় সন্নিশ্রিত শীল :** ভগবান বুদ্ধ গৃহীদেরকে ভিক্ষু সংঘকে পিণ্ড, চীবর, বাসস্থান তথা বিহার এবং ঔষধ দান করিতে নির্দেশ দান করেছেন। যাহাই হলো চারি প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল।

মহাসাধক শ্রমণ সাধনানন্দ তাঁর সাধক জীবনে প্রথমে পঞ্চ কামগুন দ্বিতীয় কঠিন চীবর দান এই দুইটির উপর খুবই গুরুত্বদান করেছেন যাহা সর্বজন বিদিত যাহার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো।

পরম পূজনীয় সাধনানন্দ সর্ব প্রথম শ্রমণ অবস্থায় যে নীতিপালন করেছিলেন তাহা হলো কাম প্রবৃত্তির নিবৃত্তি। ধনপাতায় তিনি কোন নারীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেমন দিতেন না তেমনি তিনি কোন

নারীকে দর্শনও করতেন না।

১৯৪৯-৬০ সনের দিকে একথা সবার মুখে মুখে পিড়ত। মূলতঃ ইহা ছিল ভগবান তথাগত বুদ্ধের শিক্ষা। বুদ্ধের শিক্ষা নারী অদর্শনই কর্তব্য। তার কারণ নারী দর্শনে অসক্তি উৎপন্ন হয়। চিত্ত চঞ্চল হয়। দ্বিতীয় নারীর সঙ্গে আলাপ অনুচিত, তার কারণ আলাপে বিশ্বাস জন্মে, মনের যোগাযোগ ঘটে, ফলে শীল ভঙ্গ হয়। এই নারীর কারণে সাধারণ মানুষ নহে অনেক মুনি-ঋষি ধ্যান ভ্রষ্ট হয়েছেন। মহাপরিনির্বান সূত্রের পৃষ্ঠা ২৩০শে বর্ণিত হইয়াছে। শিরচ্ছেদে উদ্যত অসি হস্ত ব্যক্তির সহিত কথা বলিবে। রক্ত পিপাসু পিশাসের সঙ্গে আলাপ করিবে বিষধর সর্পের সম্মুখীন হবে কিন্তু কখনো একাকী নারীর সম্মুখীন হবে না, কথা বলিবে না। তার কারণ নারী এতই ভয়ঙ্কর যে, নারীর প্রতি একবার আসক্ত হলে বহু জন্ম-জন্মান্তরেও সেই অসক্তির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না, ইহা শতসিদ্ধ। ভগবান বুদ্ধ হইও বলেছেন যদি কাদাচ দেখা ও আলাপ হয় তা হলে মাতা, কন্যা ও ভগ্নীর মতই আলাপ করিবে যাতে আসক্তি উৎপন্ন না হয়।

এই প্রসঙ্গে মহাকাশ্যপের স্ত্রী ভদ্রা কৃপালিনী ও মহাকাশ্যপ এক অভূত পূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ভদ্রাকৃপালিনী তৎকালে এতই রূপবতী ছিলেন যে, নিজ দেহের রূপের ছটাই তিনি প্রদীপ ছাড়া অন্ধকার রাতে চলাফেরা করতে পারতেন। তিনি ছিলেন মহাকাশ্যপ স্ত্রবিরের সহধর্মীনি। তারা উভয়ে মাতা, কন্যা ও ভগ্নীর মতই নিজেরাই আলাপ আলোচনা করে একজন দক্ষিণ দিকে একজন উত্তর দিকে গমন করে চির দিনের মত পৃথক হয়ে জীবন-যাপন করেছিলেন এবং উভয়েই অর্হত্ব মার্গফল লাভ করেছিলেন। এইভাবে শ্রমণ সাধনানন্দ কঠোরভাবে- শ্রামন্যধর্ম পালন করে শীল পূর্ণ করেছেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। সোজা কথায় তাঁর কথায় ও কাজের মধ্যে বিন্দুমাত্র হেরফের ছিল না।

শীলঙ্কপূর্ণ করার বিবরণ :

প্রত্যেকটি শীল- সম্প্রপ্ত, সমাধান ও সমুচ্ছেদ বিরতি ভেদে ত্রিবিধ যাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো-

- ১। ভিক্ষুর নিকট শীল গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বে-লোক লজ্জার শীল ভঙ্গ না করাকে সম্প্রাপ্ত বিরতি বলে।
- ২। ভিক্ষুর নিকট শীল গ্রহণ করিয়া বা স্বয়ং অধিষ্ঠান করিয়া সুন্দররূপে শীল রক্ষা করিয়া এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ফলাঙ্কায় শীল ভঙ্গ না সমাধান বিরতি কহে।
- ৩। মার্গ লাভ ক্ষণে দুষ্চরিত কর্ম সুমচ্ছেদ হয় বলিয়া মাগস্থ ব্যক্তির রক্ষিতশীল সুমচ্ছেদ বিরতি বলিয়া কথিত।
- ৪। যে ব্যক্তি শীল ভঙ্গ করে ইন্দ্রিয় দমন করে না সে ব্যক্তির শীল অবনতি শীল।
- ৫। যে ভিক্ষু শীল সম্পদে তুষ্ট থাকেন যোগ সাধনা করেন না সেই ভিক্ষুর শীল স্থিতিশীল।
- ৬। যেই ভিক্ষু সমাধির জন্য সচেষ্ট সেই ভিক্ষুর শীল উন্নতিশীল।
- ৭। যে ভিক্ষু শীল তুষ্ট না হয়ে ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য সতত উদ্যামশীল সেই ভিক্ষুর শীল নিব্বাণ প্রবন।

সাধনার দ্বিতীয় অধ্যায়- ধ্যান যোগ : ১৯৬০ইং সন হইতে ১৯৭৩ইং তিনটিলা পর্যন্ত সমাধি ঋদ্ধ পূরণের সাধনা তথা সম্যক সমাধি, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক প্রচেষ্টার সাধনা, শমথ সাধনা মধ্যকল্যাণ-

১৯৬৩ সনে কর্ণফুলী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ নির্মিত হওয়ার ফলে ২৫০ বর্গ মাইল এলাকা জলমগ্ন হয়। যে কারণে বাবু নিশী মনি চাকমা মহাসাধক সাধনানন্দ শ্রমণকে ধনপাতা হতে বোয়ালখালীর দিঘীনালায় নিয়ে আসেন এবং একটা ছোট-খাটো আশ্রম নির্মাণ করে দেন। এখানে আসার ৫ বছরের মধ্যে ১৯৬৫ সনে শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো ভিক্ষুকুল রবি এবং বোয়ালখালী দশবল বিহার ও সাধনা কেন্দ্রের বিহারাধ্যক্ষ, শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির সাধনানন্দ শ্রমণকে উপম্পাদা প্রদান করেন।

এই উপস্পাদা তার জীবনে বয়ে আনে মধ্যকল্যাণ। তিনি পরিপূর্ণভাবে ধ্যানযোগীতে উন্নীত হন। ধ্যান ছাড়া জ্ঞান হয় না। আর জ্ঞান ছাড়া মুক্তি লাভ অসম্ভব। ধ্যান লাভ করিতে হইলে প্রথমে সাধককে ধ্যানের পঞ্চ অঙ্গ লাভ করতে হয়। ধ্যানের পঞ্চ অঙ্গ লাভ না হলে প্রতিটি মানবের মধ্যে সদ্ধর্মের বাঁধা পঞ্চ নীবরণ দূর হয় না। নিম্নে এ ব্যাপারে কিছু বিবরণ দেওয়া হইল-

- ১। ধ্যান ও জ্ঞান লাভের বাধা বা অন্তরায় : পঞ্চ নীবরণ যথা স্ত্যানমিদ্ধ চিত্তের জড়তা ও অলসতা, বিচিকিৎসা- তথা সন্দেহ, দ্বিমতি, ব্যাপাদ পরের সহিত চিন্তা, ঔদ্ধত্য কৈকৃত্য তথা চিত্তের অশান্ত্যাব, কামচ্ছন্দ-বহু ভ্রমণশীল চিত্ত পঞ্চ কামগুন।
- ২। ধ্যানের পঞ্চ অঙ্গ : বির্তক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা। এগুলো ধ্যানীর পার্থিব জগতকে ভুলে, সপ্ত ত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান, তথা অরহত্ব ও বুদ্ধত্ব লাভে পরম সহায় সম্ভল।

শমথ ভাবনায় কিভাবে পঞ্চ নীবরণ দূর করিয়া চিত্তকে ধ্যান জ্ঞান লাভে শান্ত, সমাহিত ও একাগ্র করা যায় তার বিবরণ :

- ১। বির্তক প্রথম ধ্যানাঙ্গ : যাদ্বারা সাধক ধ্যানে আরোহন করে। এই ধ্যান অঙ্গের আগমনে চিত্তের পঞ্চ নীবরণ স্ত্যানমিদ্ধ চিত্তের জড়তা ও অলসতা, বিদূরিত হয়।
- ২। বিচার দ্বিতীয় ধ্যানাঙ্গ : সাধক দ্বিতীয় ধ্যানাঙ্গ দ্বারা ধ্যানের বিষয় বা স্বভাব জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ নিমর্জিত করেন। অনুমার্জন অর্থাৎ বারবার ঘষামাজা বিচার অঙ্গের স্বভাব- এই লক্ষণ হেতু ধ্যানের তথা কর্মস্থানের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়, বিচিকিৎসা বিদূরিত হয়।
- ৩। প্রীতি ধ্যানাঙ্গ : প্রীতি প্রফুল্ল স্বভাব সম্পন্ন তাই চিত্তকে প্রসারিত করে ব্যাপাদ তথা পরের অহিত চিন্তা বিদূরিত হয়ে যায়।
- ৪। সুখ-চতুর্থ ধ্যানাঙ্গ : প্রীতির নিত্য সহচর সুখ। সুখ সাধকের শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দৈন্য দূর করে সাধক, প্রীতি ও সুখের উদয়ে শান্ত

সমাহিত ও একাগ্র চিত্তে ধ্যান লাভ করেন ফলে ঔদ্ধত্য-কৈকৃত্য তথা চিত্তের অশান্ত্যাব বিদূরিত হয়।

৫। একাগ্রতা পঞ্চম ধ্যানাঙ্গ : একটি মাত্র অবলম্বনে চিত্তের নিশ্চল অবস্থার নাম একাগ্রতা। এই একাগ্রতা বহু ভ্রমণ শীল চিত্ত কামছন্দকে বিদূরিত করে। এই একাগ্রতাকে ধর্মীয় পরিভাষায় বলা হয় অপর্ণা। অপর্ণা পূর্ণ ধ্যান চিত্ত তথা সমাধি অবস্থা। ইহার ফলে চিত্ত সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে। কিন্তু বহিরিন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয় ফলে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, তৃষ্ণা উৎপন্ন হতে পারে না। এইভাবে সাধকের চিত্তে পঞ্চ কামগুন বা তৃষ্ণা উৎপত্তি নিবারিত হয়।

সম্যক সমাধি : সমাধি চার প্রকার যথা, প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান। এবার চারি ধ্যান প্রথম ধ্যানে বিতর্ক বিচার প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা বিদ্যমান থাকে। দ্বিতীয় ধ্যান প্রাণীর সঙ্গে বিতর্ক বিচার উপশান্ত হয় চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। সাধক চৈতসিক প্রসাদ লাভ করেন। চিত্তে বলবর্তী শ্রদ্ধার উদ্বেক হয়। তাঁর চিত্ত প্রীতিতে আপ্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয় ধ্যান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক, বিচার প্রীতির অবসান হয়। সাধক উপেক্ষা জনিত সুখ অনুভব কনে। এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আবারও অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে তিনি শারীরিক সুখ-দুঃখ এবং মানসিক সৌম্যনস্য ও দৌম্যনস্য পরিহার করিয়া চতুর্থ ধ্যান লাভী হয়ে বিহার করেন। চতুর্থ ধ্যানে উপেক্ষার প্রাধান্য অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চতুর্থ ধ্যানিক চিত্তই পরমার্থ জ্ঞান লাভের উপায়োগী।

সম্যক সমাধি বলিতে চঞ্চল একাগ্রতা রহিত চিত্ত বা মন সাক্ষৎরূপে ধর্মকে সুনীতি বা চারি আর্য্যসত্যকে দর্শন করে না বা অনুভব করিতে পারে না। সন্ধর্মের বা সত্য ধর্মের দর্শন না হলে সাধক জন্ম দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। এজন্য সাধনার প্রথম পর্যায় চিত্তের একাগ্রতা আনায়ন ও শান্তি বিধান একান্ত প্রয়োজন। এজন্য জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কুশল চিত্তই সমাধি মুখ, সমাধি নিম্ন ও তদবস্থায় স্থিত। রনক্ষেত্রে হস্তী, অশ্ব বা পদাতিক প্রভৃতি যুদ্ধ সজ্জা রাজাকে কেন্দ্র করেই সেরূপ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত কুশল চিত্তে সমাধিস্থ

ব্যক্তিই যথাযথ জ্ঞাত হন। মুধু মক্ষিকা নিরলস চিত্তে মোচাক নির্মাণ করে কোন প্রকার কপটতা নেই তার চিত্তে ঠিক তদ্রূপ চতুর্থ ধ্যানীক চিত্ত কুল কিনারাহীন সমুদ্রে দিশাকাকের মত সাগরের পরপারে নির্জন দ্বীপের সন্ধান করে। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র অষ্ঠ সমাপত্তি লাভ করিয়া মোট ২৬টি লোকভূমি তথা নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞ আয়তন লাভ করিতে পারে, নিৰ্ব্বানের চারি মার্গ ও ফল এবং নিৰ্ব্বান লাভ করিতে পারে না যে কারণে সাধককে বিদর্শন সাধনা করিতে হয়।

সম্যক স্মৃতি : স্মৃতিবিহীন চিত্ত, কর্ণধার বিহীন তরনীর ন্যায় বিপদগ্রস্ত। এইটি চারি প্রকার-কায়ানুদর্শন। চিত্তানুদর্শন, বেদনাদুর্শন ধৰ্ম্মানুদর্শন। তথাগত বুদ্ধ প্রত্যহ ভিক্ষুগণকে একথা বলতেন- প্রমাদ মৃত্যুর পদ, অপ্রমাদ অমৃতের পদ। স্মৃতি কুশল অবস্থাকে সর্বদা জাগ্রত রাখে। স্মৃতি ছাড়া প্রজ্ঞা উৎপন্ন হতে পারে না। স্মৃতি উৎপন্ন হলে সাধক হিতাহিত জ্ঞাত হন। উপকারী অনুপকারী ধর্ম বিশ্লেষণ করেন। স্মৃতি দ্বারা সাধক সেবনীয় ধর্ম সেবন, অসেবনীয় ধর্ম অসেবন ও পরিত্যাগ করেন। সাধক নিজের জ্ঞানের দ্বারা হিতকর সেবন করেন অহিতকর ধর্ম বর্জন করেন। স্মৃতি জাগ্রত হলে সাধক ক্রমশ জানতে পারেন, এইটি চতুঃস্মৃতি প্রস্থান এইটি চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যাঙ্গ সাইত্রিশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম ও আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। চারি স্মৃতি প্রস্থান বুদ্ধগণের গমন মার্গ। ইহার অনুশীলনে সাধক সবার আগে সিদ্ধি লাভ করেন। লৌকিক শমথ জ্ঞানের মাধ্যমে উৎপন্ন উন্নত জ্ঞানই বিদর্শনের প্রজ্ঞারূপ নিৰ্ব্বাণ বর্ত্তিকা। এইখানে শমথ সমাধির পরিপূর্ণতা।

প্রজ্ঞা ঋদ্ধ- বিদর্শন সাধনা জ্ঞান মার্গ ভিক্ষু সাধনানন্দ শ্রমণের রাজ বনবিহারে ১৯৭৪ ইং হইতে ১৯৯০ ইং পর্যন্ত সাধনা অন্তে কল্যাণ-

বিদর্শন সাধনা তথা প্রজ্ঞা স্বক্ক : প্রজ্ঞা সাধনার দুইটি স্বক্ক যথা- সম্যক সংকল্প এবং সম্যক দৃষ্টি-

১। সম্যক সংকল্প : ইহা ত্রিবিধ যথা নৈক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প, অবিহিংসা সংকল্প।

- ২। নৈষ্কম্য সংকল্প : ভোগ স্পৃহা ত্যাগ করে বৈরগ্য অবলম্বনের সংকল্প তাহা নৈষ্কম্য সংকল্প।
- ৩। অধ্যাপাদ সংকল্প : অকুশলভাব ত্যাগ করিয়া কুশল চিন্তার আত্মনিয়োগ করার নামই অব্যাপাদ সংকল্প।
- ৪। অবিহিংসা সংকল্প : হিংসাভাব ত্যাগ করিয়া সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী করুণা পরায়ন হওয়ার যে ভাব- তাহা অবিহিংসা সংকল্প।

সম্যক দৃষ্টি : জগত ও জীবন সম্পর্কে মূল প্রশ্ন ও তার সমাধান, অন্যভাবে বলিতে গেলে জড় জগত ও জীবজগতের ধ্বংস ও সৃষ্টির এবং অস্তিত্বের প্রবাহকে সম্যক জ্ঞানে জানার নামই সম্যক দৃষ্টি বা বিদর্শন জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। ইহা ত্রিলোক ভব-সংসার সৃষ্টিতত্ত্ব যাহা অন্যকোন ধর্মবেত্তা আয়ত্ত্ব করতে পারেন নাই। এই কারণে বৌদ্ধ ধর্ম শ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া স্বীকৃত ও অভিহিত। ধ্বংস ও সৃষ্টির দুইটি ধারা, ইহার দুইটি নীতি আছে- (ক) উহার উৎপত্তিতে ইহার উৎপত্তি, ইহা অনুলোম নীতি। (খ) উহার নিরোধে ইহার নিরোধ-ইহা প্রতিলোম নীতি। এই দুই নীতিতে জড়-জগতে ও জীব জগতের উৎপত্তি ও নিরোধের ধারা। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন জগতে হেতু কল প্রত্যয়তা সর্বত্র দৃষ্ট হয়, কোথাও তার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। ইহা হলো বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র তথা সৃষ্টির গোপন রহস্য আবিষ্কার। সমগ্র জড়-জগত ও জীব জগত (১) উৎপত্তিক্ষণ (২) স্থিতিক্ষণ (৩) বিলয়ক্ষণ এই ত্রিবিধক্ষণ বিভাগ দ্বারা প্রবর্ত্তিমান। জগত এই ত্রিবিধক্ষণ বিভাগে দ্বারা পরিবর্তনশীল সংক্ষেপে জগত উদয় বিলয় শীল, মুহূর্তকাল স্থির নহে। প্রশ্ন উঠে যদি এত দ্রুত গতিতে পরিবর্তনশীল হয় তাহা উপলব্ধি হয় কিভাবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে- বৌদ্ধ দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ধর্মী হেতুশ্লভবা তেসং হেতুং তথাগত আহ, তেসং চাপি নিরোধা এবংবাদী মহাশ্রমনো। এই কারণে বৌদ্ধধর্মকে বলা হয় কারণ-ফলবাদী ধর্ম তথা কার্য্যকারণ প্রবাহ। ইহাই তথাগতবুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার এবং বিশ্ব মানবকূলের প্রতি তাহার শ্রেষ্ঠ অবদান। কারণ ছাড়া কোন কর্ম সম্পাদিত হয় না। আর কর্মছাড়া কোন ফলও হয় না। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কর্মের, বিভিন্ন ফলের উৎপত্তি বস্তুত:

কার্য্যাকারণ ফল এক অভিন্ন প্রবাহের বিভিন্ন অংশ মাত্র, যেমন সুখের কারণ লোভ, দুঃখের কারণ দ্বেষ এবং মোহের কারণ অজ্ঞানতা ।

১) মৃত্তিকা ঘট, স্বর্ণ, শিলা, লোহ, গাছ ইত্যাদি আকার আকৃতিতে বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও এই সবার মূল উপাদান, আপধাতু । তেজধাতু, বায়ুধাতু, পৃথিবীধাতু । এগুলো জড় জগতের সৃষ্টির মূল উপাদান ।

২) পশু-পাখী, মানুষ, দেবতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন নামে বিভক্ত হলেও ইহাদের মূল উপাদান নামরূপ । এরা স্ব-স্ব কর্ম বিপাকে বিভিন্ন প্রাণীতে বিভক্ত তথা প্রাণী জগতের সৃষ্টি । বিশ্বের জীবগন এই নামরূপের প্রবাহে জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া ভব হইতে ভবান্তরে জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে । এই নামরূপ অবিদ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । বিদর্শন জ্ঞান প্রভাবে এই অবিদ্যার অন্ধকার বিদূরিত হইয়া যায় । তাই জাগতিক পরম সত্যকে জানার জন্য বিদর্শন সাধনার প্রয়োজন ।

বিদর্শনের মূলতত্ত্ব তিনটি যথা- ১) নিত্য নিত্য বিচার ২) পরিণাম বিভাগ ৩) স্থির ক্ষণ বিভাগ ।

যেই জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর নিত্যানিত্য বিচার করার ক্ষমতা জন্মে স্বজাতীয় বিজাতীয় পরিণাম উপলব্ধি হয়, বস্তু উৎপত্তি, স্থিতি বিলয়, কুশল-অকুশল কর্ম বিপাক পঞ্চ উপাদান স্বরূপ বা নামরূপ এবং ইহাদের অনিত্য দুঃখ অনাত্ম বিচার জ্ঞান জন্মে তারই নাম বিদর্শন জ্ঞান বা প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞা স্বরূপ দ্বিবিধ যথা সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প ।

সম্যক দৃষ্ট- সত্য বা অপ্রাপ্ত সত্য দর্শন । এটি দুই প্রকার- লৌকিক সম্যক দৃষ্টি এবং লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি ।

ক) লৌকিক সম্যক সৃষ্টি : স্বী কর্মফল ভোগী সত্ত্ব ভিন্ন আমি অন্য কিছু নই । এই জ্ঞান কর্ম স্বকীয়তা জ্ঞান এবং সত্য লৌকিক জ্ঞান লৌকিক সম্যক দৃষ্টি ।

২) মার্গ ও ফল সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞা লোকান্তর সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথক জন শেখ, অশেখ ভেদে ত্রিবিধ।

শেখ : স্রোতাপত্তিমার্গস্থ হইতে অর্হত্ব মার্গস্থ পর্যন্ত সপ্তধা বিভক্ত।

অশেখ : অশেখ সম্যক বাক্য, অশেখ সম্যক কর্ম, অশেখ সম্যক আজীব, অশেখ সম্যক প্রচেষ্টা, অশেখ সম্যক স্মৃতি। অশেখ সম্যক সমাধি, অশেখ সম্যক জ্ঞান, অশেখ সম্যক বিমুক্তি। অশেখ সম্যক দৃষ্টি, অশেখ সম্যক সংকল্প। অরহতের দশ অঙ্গ।

বিদর্শন জ্ঞান যত প্রকার, প্রজ্ঞাও তত প্রকার। বিদর্শন জ্ঞানই প্রজ্ঞা- ইহা দশ প্রকার, সংমর্শন জ্ঞান, উদয় ব্যয় জ্ঞান, ভয় জ্ঞান, ভঙ্গ জ্ঞান, আদীনব জ্ঞান নির্বোধ জ্ঞান, মুমুক্ষা জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা জ্ঞান, সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান, অনুলোম জ্ঞান।

এই লৌকিক দশ বিদর্শন জ্ঞান যেন স্তরে স্তরে সোপানে আরোহন করিবারভাবে সজ্জিত এবং সোপনের সর্বোচ্চ স্তরের পরই লোকান্তর মার্গজ্ঞান আরম্ভ। লোকান্তর মার্গজ্ঞানের আটটি শ্রেণী যথা- স্রোতাপতি মার্গ জ্ঞান ও ফলজ্ঞান সন্ধ্যাগামী মার্গ জ্ঞান ও ফল জ্ঞান, অনাগামী মার্গ জ্ঞান ও ফল জ্ঞান, অর্হত্ব মার্গ জ্ঞান ও ফল জ্ঞান লোকান্তর এই জ্ঞান মার্গ নির্বাণ পর্যন্ত বিস্তৃত। নির্বানই ইহার শেষ গন্তব্য স্থল। এই মার্গের চরমসীমায় উপনীত হইলে জীবের জন্ম-মৃত্যুর সকল কারণ সমূহ বিনষ্ট হয়। যেখানে জন্ম, জরা, ব্যাধি ঘরন প্রিয় বিয়োগ, অপ্ৰিয় সংযোগ তথা কোন দুঃখ নাই। যেখানে আছে চির শান্তি, সুখ, তাহাই নির্বাণ কথিত। এখানেই বিদর্শন সাধনার পরিপূর্ণতা।

এবার বৌদ্ধধর্ম কি? : যা পৃথিবীকে নতুন আলোকে আলোকিত করেছে এবং সম্যক সম্বুদ্ধের জীবদর্শনায় অগনিত মানুষকে জন্ম-দুঃখ হতে মুক্তি দান করিয়াছে। পূজনীয় ভগ্নে প্রায়শঃ বলতেন তোমরা লোভ, দ্বেষ, মোহ নিয়ে থেকো না। এগুলিই মানব জীবনের সকল দুঃখের কারণ। বৌদ্ধ দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে যেই, মানসিক ব্যাধিতে বিশ্বের মানবজাতি প্রভাবিত ও আক্রান্ত বৌদ্ধধর্ম সেই ব্যাধির আরোগ্য বিতান। এই ব্যাধি হচ্ছে মানব চিন্তের লোভ,

দ্বেষ, মোহ। এই লোভ, দ্বেষ, মোহ মানুষের মনের অতীত ও বর্তমান মন্দ শক্তি সমূহ, যা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ঘটনাবলীর বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। বর্তমানে এই অসন্তুষ্টি প্রায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। অসন্তুষ্টি অসন্তোষ উৎপন্ন করে, অসন্তোষ ঘৃণার জন্মদান করে। ঘৃণা শত্রুতার সৃষ্টি করে। শত্রুতা যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে, তাই সমগ্র বিশ্ব আজ দ্বন্দ-সংঘাতময়। এখন সমগ্র বিশ্ব দোষযুক্ত বৃত্তে প্রবেশ করেছে- তা নিসন্দেহে বলা যায়।

এই দোষযুক্ত বৃত্ত হতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। কারণ এই ধর্ম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মনো বিজ্ঞান। বৌদ্ধধর্ম মানব মনের স্বভাবের বাস্তবতার মধ্যে এক নব দৃষ্টি লাভের জন্য এককভাবে এবং সকলের গবেষণার প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা উৎকৃষ্ট মানসিক শক্তি উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম। মানসিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বৌদ্ধধর্মের বিকল্প অন্য কোন কিছু নেই। এই দিকটা বিবেচনা করে সকল জীবের প্রতি মৈত্রী পরায়ন হওয়া, শীল পালনের দ্বারা নৈতিক জীবন তথা নিষ্পাপ জীবন গড়ে তোলা, সুত্রে বর্ণিত উপদেশ অনুসারে নিজের ও অপরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বিশিষ্ট খের ও খেরীদের জীবন দর্শনের প্রতি অনুপ্রানিত হওয়া পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বভাব গড়ে তোলা। বৌদ্ধধর্ম অমৃতময় ধর্ম, আর এই অমৃতের আনন্দ পেতে হলে আমাদেরকে মানুষ হিসাবে মানবিক মূল্যবোধ, মানসিক দিক থেকে মানসিক মূল্যবোধ, ধর্মের দিক থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সমাজের দিক থেকে সামাজিক মূল্যবোধ থাকতে হবে। কারণ এসব বোধকে নিয়াই বৌদ্ধধর্ম। এই বোধ শক্তির কারণে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অধ্যুষিত। যেই ধর্মে মানুষে মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। উচ্চ-নীচু, কুলের ভেদাভেদ নেই, জাতিগত কোন নিপীড়ন নেই, রাষ্ট্র রাষ্ট্রের ভেদাভেদ নেই তাই একমাত্র এই ধর্মই এক সুন্দর ও সুখময় বিশ্ব গড়ে তুলতে সক্ষম। এই ধর্ম মানুষকে মানবতার উৎকর্ষ সাধন, চিন্তের সকল অকুশল বিদূরনে, পুণ্য ও কুশল মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে এবং শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় বিশুদ্ধ চারিত্র, বিশুদ্ধ চিন্তা, বিশুদ্ধজ্ঞান লাভে চির প্রশান্তির আধার নির্বাণ মার্গে উপনীত করতে পুরোপুরি সক্ষম।

শ্রমণ সাধনানন্দের অর্হত্ব মার্গফল লাভ

যারা পূর্ব পূর্ব জন্মে, পারমী পূর্ণ করিয়া মানব জন্ম লাভ করে থাকেন, তাদেরকে বলা হয় পরমার্থ মানব। এই পরমার্থ মানবগণই মানুষের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তারাই পূর্ব জন্মের পারমী ও ইহ জীবনের প্রচেষ্টায় অর্হত্ব ও নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন। যারা পরম আৰ্য্য পুরুষ মহাসাধক সাধনানন্দ মহাথেরোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছেন তাদের বিশ্বাস- এই মহাসাধক রাজ বনবিহারে আসার পর ১৯৭৪ হইতে ১৯৯০ সনের মধ্যে অর্হত্ব মার্গফল লাভ করিয়াছেন। এই সময়ে দিনে দিনে কঠিন চীবরদান যেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠে লোকের সমাগত হতে থাকে অকল্পনীয় পক্ষান্তরে রাজ বনবিহারের স্থাপত্য নিদর্শন যথা মূল বুদ্ধ মন্দির বনভন্তের নির্বাস কুঠির, দেশনালয়, ছয় দেবলোক, বেইনঘর, ইত্যাদি অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে দেবলোকের মতই শোভিত হয়ে উঠে। এই সময় হতে তিনি একদিকে প্রাণবন্ত ধর্ম দেশনা করতে থাকেন অন্য দিকে সিংহনাদে প্রাণবন্ত ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। এসব কারণে রাজ বিহার পরিচালনা কমিটি তাঁকে অর্হৎ ও শ্রাবক বুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এবার তাঁর অর্হত্ব ও পরিনির্ব্বাণ লাভ এবং ধর্মদেশনা সম্পর্কে যৎ সামান্য বিবরণ দেওয়া হলো-

বনভন্তের ধর্মদেশনা

একদিন পরম পূজনীয় বনভন্তে ধর্ম দেশনায় বলতে লাগিলেন- আমি একটি নির্ব্বাণ পুকুর খনন করেছি। তোমরা এস এবং দেখ। তিনি তাঁর শতাধিক শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে ২৫/৩০ হাজার সমবেত দায়িক-দায়িকাগণকে সিংহনাদে বলে উঠলেন। নির্ব্বাণ আছে নির্ব্বাণ লভ্য, তোমরা এই নির্ব্বাণ লাভ করিয়া, দুঃখ হতে মুক্ত হও। তিনি উদ্বৃতি দিয়ে বললেন যারা এই সভামণ্ডপে এসেছ তারা নির্ব্বাণ পুকুর পাড়ে এসেছ। কিন্তু রাজকুমার জুনিবাবু এখানে আসেন না, দূর থেকে পুকুরটি দেখেন মাত্র। দ্বিতীয় তিনি বলেন- যে ভিক্ষু সংঘ চীবর পরিধান করেছে, তাহা হলো ভগবান বুদ্ধের প্রদত্ত নির্ব্বাণগামীদের পোষাক। আমি আমার শিষ্যগণকে এই পোষাক পরিধান করাইয়াছি, উদ্দেশ্য একটাই তারা এই পোষাক পরিধান করে নির্ব্বাণ পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে এবং চিন্তের সকল মলাদি বিধৌত করে উপরে উঠবে।

তিনি খেদ করে বলেন তারাও পুকুরে নামেনা, তাই নিকর্বাণ লাভ করতে পারছেন। নিকর্বাণ কি তিনি বুঝিয়ে দিয়ে বলেন- চিত্তের মল হচ্ছে কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা, আর অবিদ্যা- তথা লোভ-দ্বेष-মোহ। এগুলো চিত্ত হইতে মূলোচ্ছেদ করতে পারলে নিকর্বাণ লাভ করা যায়। বনভন্তে এগুলোর মূলোচ্ছেদ করেছে। এখন বনভন্তের কোন দুঃখ নেই। কেবল সুখ আর সুখ। তোমরাও আমার মত সুখী হও। পাঠক বুঝতে চেষ্টা করুন, তাঁর এই দেশনার তাৎপর্য্য কি হতে পারে।

বনভন্তের ধর্মদেশনার বিশেষত্ব :

পরম পূজনীয় বনভন্তে বিশ্ব বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস যেভাবে দার্শনিক আলোচনা করতেন ঠিক সেইভাবে ধর্মদেশনা করে থাকেন। তাহা হলো প্রশ্ন ও উত্তরে ধর্মদেশনা। তিনি বলতেন মেয়ে তথা নারীর সঙ্গে থাকা কি সুখ ? বল বল কোন উত্তর না পেলে তিনি সিংহনাদে গর্জে উঠতেন কদা, কদা অর্থ্যাৎ বলো বলো, তখন দায়কগণ এক সঙ্গে বলে উঠেন দুঃখ-দুঃখ। এবার তিনি প্রশ্ন করতেন, নারী নিয়ে থাকবে কি ? জবাব হতো না- ভন্তে না।। অতঃপর তিনি বলেন নারী নিয়ে তোমরা থাকবেনা কারণ নারী নিয়ে নিকর্বাণ লাভ করা যায় না, তাই ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেছেন।

হাস্য কৌতুক করে ধর্মদেশনা- তিনি কখনও কখনও হাসি রহস্য করে বলতেন- বানরকে একদল সোনা ও একটা লাউ দিলে কোনটা নিবে। দায়কগণ উত্তর করতেন লাউটা নেবে। তিনি বলতেন ঠিক বলেছ, কারণ বানর সোনার মূল্য বোঝে না। তোমরা ও নিকর্বাণের মূল্য বুঝনা তাই নারী নিয়ে গৃহবাস কর। এই নারীরা লাউয়ের মত পটাংগলা জিনিষ।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে আবার অনেক সময় সরচিত কবিতাও গানের ছন্দে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা দিতেন যা- সকলের মনকে আকর্ষণ করতো।

পূজনীয় ভন্তে দক্ষিণে রাজনীয়া হতে উত্তরে পানছড়ি পর্যন্ত মধ্যস্থলে কাচলং, বাঘাইছড়ি, সুবলং, মায়নী, দিঘীনালা, বরকল অনেক অনেক জায়গায় ধর্ম প্রচার ও ধর্মদেশনা করেছেন আর তাঁর সঙ্গে থাকতেন ডাঃ অরবিন্দু বড়ুয়া। তিনি বোধহয় ২০ / ২৫টি বনভন্তের দেশনা ছাপাখানায় ছাপিয়ে প্রকাশ

করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ক্যানসার রোগে মারা গেছেন, আমি তার পরলৌকিক সংগতি কামনা করি।

বনভন্তের দেশনা নিয়ে অনেক বই লিখা হইয়াছে তাই এই দেশনা নিয়ে আর কিছু লেখা হলো না।

দানোত্তম কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠানের উৎপত্তির বিবরণ এবং ১৯৭৩ সাল তিনটিলায় সর্বপ্রথম (তারিখ- ৫/১১/৭৩ইং ও ৬/১১/৭৩ইং সোমবার ও মঙ্গলবার) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দানানুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ ভিক্ষুর নির্দেশ।

দানোত্তম কঠিন চীবর দানের উৎপত্তি : ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণকে দিকে দিকে, দেশে দেশে ধর্ম প্রচারে যেতে নির্দেশ দিতেন- ‘চরথ ভিকথবে চারিকং’ বহুজন হিতায় বহু জন সুখায়, লোক অনুকম্পায় আত্ম হিতায়, সুকায় দেব-মনুসসানং। হে ভিক্ষুগণ তোমরা বহুজনের হিতের জন্য, সুখের জন্য, জগতের অনুকম্পা ও দেব-মানবের মঙ্গল এবং আত্ম হিতের জন্য দিকে দিকে বিচরন কর। বর্ষার সমাগমে পথঘাট কর্দমাক্ত ও দর্গম হয়ে ভিক্ষুদের চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে দেখে, বুদ্ধ আষাড় মাস থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিনমাসকে বর্ষাবাস বলিয়া অভিহিত করত, এক বিহারে স্থায়ীভাবে বসবাস করতঃ ধ্যানানুষ্ঠান করার উপদেশ দেন। এই তিন মাস আধ্যাত্মিক সাধনাকাল সকল ভিক্ষুগণের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যে বর্ষাবাস আশ্বিনী পূর্ণিমায় শেষ হয় তাহা পূর্ব কার্তিক প্রবারনা এবং যে বর্ষাবাস কার্তিক পূর্ণিমায় শেষ হয় তাহা কার্তিক প্রবারণা বলা হয়। প্রবারণা শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। প্রবারণা অর্থ- আশার পরিতৃপ্তি, অভিলাষ পূরণ এবং ধ্যান শিক্ষার সমাপ্তি বুঝায়- অন্যদিকে আনন্দের দিন, সোজা কথায় প্রবারণা পূর্ণিমা হচ্ছে আনন্দ পূর্ণিমা। কারণ ভিক্ষু তিন মাস যাবৎ আধ্যাত্মিক সাধনায় রত থাকিয়া ধ্যান ও জ্ঞান লাভ করে থাকেন। মহাবগেগ ইহা উল্লেখ আছে যে, ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালে ৩০ জন পাঠেয়বাসী অন্যস্থানে পাবেয়বাসী ভিক্ষুকে সর্বপ্রথম কঠিন চীবর দান গ্রহণের অনুজ্ঞা প্রদান করেন। বিষয়টি এইরূপ দীর্ঘকাল একটানা ব্যবহারের ফলে পরিধেয় চীবরগুলি জীর্ণ ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কথিত আছে জনৈক পরিচারিকা

মহোপসিকা বিশাখার আদেশক্রমে আহারের জন্য বিহারে ভিক্ষুগনকে আহ্বান করিতে গিয়া তাদের নগ্ন গায়ে স্নান করতে দেখতে পান। এই বিষয় তাঁকে জানানো হলে মহোপসিকা বিশাখা সম্ভবতঃ এই ত্রিশজন ভিক্ষুকেই বুদ্ধের অনুমতিক্রমে সর্ব প্রথম কঠিন চীবর দান করেন। তিনি তথাগত বুদ্ধের অনুমতিক্রমে এক আহোরাত্রির মধ্যেই বিপুল অর্থ ব্যয়ে চীবর প্রস্তুত করে পরদিন অরুনোদয়ের পূর্বেই ভিক্ষুদেরকে কঠিন চীবর দান করেন। ভিক্ষুদের চীবরের অভূতপূর্ব দৈন্যই বোধ হয় ব্যাপারটিকে যতদূর সম্ভব তরান্বিত করতে মহাউপসিকাকে অনুপ্রানিত করেছিল। অতঃপর সেই থেকে প্রতিবছর প্রবারণা পূর্ণিমার পর থেকে একমাসের মধ্যে কঠিন চীবর দান করার প্রথা চালু হয়।

যে কারণে এই দান সর্বপেক্ষা মহাফল দায়ক তৎ সম্পর্কে স্বয়ং ভগবান তাহার বিবরণ প্রদান করেছেন। একদা ভগবান বুদ্ধ হিমালয়ের অনবতপুত্রদে পাচশত অরহঁত্বফল লাভী ভিক্ষুর সামনে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করেন। গৌতম বুদ্ধ শিখী বুদ্ধের সময়ে সঞ্চয়নামে ব্রাহ্মনকূলে জন্ম নিয়া বুদ্ধকে কঠিন চীবর দান করেন। নাগিত স্থবির তাঁহার জন্মে বসুমতি নগরে যখন দানপতি ছিলেন তখন তিনিও বুদ্ধ ও সংঘকে কঠিন চীবর দান করেছিলেন। ইহা বর্ণিত হইয়াছে কেহ যদি এক শতবছর যাবৎ দান করে তথাপি কঠিন চীবরদানের ষোলভাগের এক ভাগ ফলের সমান হয় না এই কারণে এই দানকে দানোত্তম কঠিন চীবর দান বলা হয়।

দানোত্তম কঠিন চীবর দান, পরম পূজনীয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তের) অবিস্মরনীয় অবদান। তিনি তিনটিলার বনবিহারে অবস্থানকালে ১৯৭৩ সনে ৫/১১/৭৩ হইতে ৬/১১/৭৩ সন রোজ- সোমবার ও মঙ্গলবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে সর্বপ্রথম কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান করার নির্দেশ প্রদান করেন। এই তিনটিলাই হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ, নর-নারীর সমাগম হইয়াছিল। এই দিন চিরাচরিতভাবে মার কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে প্রবল অবরোধ সৃষ্টি করে। তুমুল ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি বর্ষণে তুলাধুনা ও চরকায় সুতা কাঁটা ইত্যাদিতে সুদক্ষ কর্মী ও বয়ন শিল্পীগণ চরম বিপদাপন্ন হন বটে কিন্তু দমিত হন নাই। তারা যে যেমন করে পারেন তার পলিন ও গীলাপ কাপড় ইত্যাদির সহায়তায় ধীরে ধীরে তুলা ধুনা, চরকায় সুতা কাঁটা, রং করা ও বেইন বুনা কাজ সম্পাদন

করেন এবং সর্বশেষে কঠিন চীবর সেলাই করে দান দেওয়ার জন্য উপযুক্ত করেন। এইভাবে সুদূর অতীতে পূণ্যবর্তী বিশাখা প্রবর্তিত কঠিন চীবর দান ২৫০০ বছরের পর তিনটিলায় সম্পাদিত হয়।

এই কঠিন চীবর দান সম্পাদনের সঙ্গে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। নির্বাপণ বাল্য চাকমা নামে একজন চরকায় সুতা তোলা শিল্পী মাঝরাতে হঠাৎ উধাও হয়। তাঁকে অনেক খোঁজ করে কোথাও পাওয়া যায় নাই। তিনি যে চরকায় সুতা তুলতেন অনেক দক্ষ কর্মী চেষ্টা করে সেই চরকা ব্যবহার করতে পারেন নাই।

তিনি ধর্মানুষ্ঠানে যে ঠিকানা দিয়েছেন পরে সেই ঠিকানায় কোন নির্বাপণ বাল্যর খোঁজ পাওয়া যায় নাই। বিষয়টি পূজনীয় বনভন্তেকে অবগত করা হলে তিনি বলেন দেব-দেবীগণ মানব-মানবীর বেশে এসে অনেক সময় পূণ্য কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন যাহা বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। হয়ত কোন স্বর্গীয়া দেবী এসে এই দানোত্তম কঠিন চীবরদানে অংশগ্রহণ করেছেন। বনভন্তের একথা সবাই বিশ্বাস করেছেন।

পূজস্পদ বনভন্তে পরবর্তী বছর তথা ১৯৭৪ সনে রাজ্যমাটি রাজ বনবিহারে আমন্ত্রণক্রমে চলে আসেন। তিনি সেই ১৯৭৪ হইতে ২০১০ ইং তথা ৩৬ বছর ধরে রাজ বনবিহারে অবস্থান করছেন। এখানে এক বিশাল আকারে বেইন ঘর নির্মিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বছর এখানে দানোত্তম কঠিন চীবর দান সম্পাদিত হইতেছে। এই রাজ বনবিহারেই পূজনীয় বনভন্তের সকল প্রকার সাফল্য ও সাধনার পরিপূর্ণতা। আমি এই রাজ বনবিহারের সুরক্ষা ও উন্নতি কল্পে একটি প্রস্তাবনা পেশ করলাম :-

বিঃদ্রঃ - কঠিন চীবর দানানুষ্ঠানে পার্বত্য ভিক্ষু সংঘকে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটিকে বিশেষভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহা করা হলে সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হইবে।

রাজ বনবিহারকে নিয়ে কিছু ভাবনা

অনাদিকালের স্রোতে ভেসে আসা এক পরমার্থ মানব আর্ষ্য পুরুষ মহাসাধক সাধনানন্দ মহাথেরো (বনভন্তে) যেমন পার্বত্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণের অতীব পূজনীয় তেমনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীয় আমাদের পূজনীয়। রাজ বনবিহার এই অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ভিক্ষুসংঘের নিবাসস্থল, তাই এই রাজবন বিহার তাদের স্মৃতি, ভাবমূর্তি ও গৌরবকে বর্তমানে তীর্থক্ষেত্র রূপে যেভাবে বহন করে চলেছে, তাদের স্মৃতি ও গৌরব চির অম্লান ও সমুজ্জ্বল হয়ে থাক, তাহা এই রাজ বনবিহারের সকল দায়ক-দায়িকাগণের একান্ত কাম্য। এই লক্ষ্যে আমার ব্যক্তিগত কিছু ভাবনা ও কামনা।

আমার জীবনে ভারতে বৌদ্ধ পুণ্য তীর্থক্ষেত্র দর্শনের সুযোগ হয়েছে ১৯৯৮ইং সনে। আমার দৃষ্টিতে বুদ্ধগয়া, রাজগার, বৈশালী, কুশীনারা ও লুম্বিনী পুণ্যক্ষেত্র যেমন বিশাল তেমনি মনোরম। অনুরূপভাবে বাংলাদেশে রাজ বনবিহার ৪৫ একর জমি নিয়া মহাসাধক বনভন্তের ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলীয় যে ভাবমূর্তি ও গৌরব বহন করে চলেছে বাংলাদেশে আর কোথাও তার নজীর নেই। ইহা শুধু পার্বত্য বৌদ্ধগণের নয় সারা বাংলাদেশের বৌদ্ধগণের অমূল্য সম্পদ। ফুল যদি অযত্নে ধুলায় পড়ে থাকে, সেই ফুলগুলিকে দৃঢ় সুতায় মালা গাঁখে রাখা যেমন প্রয়োজন তদ্রূপ রাজ বনবিহারের অমূল্য সম্পাদকে সকল প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা করে গৌরবমণ্ডিত করে রাখা আমাদের সবার কর্তব্য। এই লক্ষ্যে আমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র চিন্তা-ভাবনা চাকমা রাজ বাহাদুর থেকে শুরু করে সকল দায়ক-দায়িকাগণের বিজ্ঞ বিচার-বিবেচনা বিসংযোজন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের জন্য এই প্রস্তাবনা উপস্থাপন করিলাম। চাকমা জাতির রাজা ব্যারিস্টার দেবশীষ রায় রাজ বনবিহার বিনির্মাণের জন্য ২৫ একর জমি দান করিয়াছেন বর্তমানে হইার মূল্য ৭৫ কোটি টাকারও অধিক। তাই তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই বিহারকে অভিহিত করা হইয়াছে রাজ বনবিহার। রাজা বাহাদুর এই বিহারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তাহা একবাক্যে আমরা স্বীকার করি কিন্তু রাজা বাহাদুরের একার পক্ষে এই জাতীয় সম্পদকে সুরক্ষা করার সম্ভব নহে বিধায় আমি এই রাজবিহারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব একটি ট্রাস্ট তথা তত্ত্বাবধায়ক/অভিভাবক মন্ডলীর উপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব রাখছি। এই ট্রাস্টে বা অভিভাকমণ্ডলী গঠিত হবে নিম্নের ব্যক্তিবর্গকে নিয়া।

রাজ বনবিহার বোর্ড অফ ট্রাস্ট তথা তত্ত্বাবধায়ক অভিভাবক
বোর্ড গঠন :

- ১। রাজমাতা- রাণী আরতী রায়
- ২। চাকমা রাজা- ব্যারিস্টার দেবানীষ রায়
- ৩। রাজকুমার ত্রিভূবন আর্যদেব রায়
- ৪। বাবু গৌতম দেওয়ান
- ৫। বাবু সুকুমার দেওয়ান

বিঃদ্রঃ - এই ট্রাস্ট বা অভিভাবগণই রাজ বনবিহারের মূল স্বত্ত্বাধিকারী তা করা
না হলে এই বন বিহারের উত্তরাধিকারী কেহ থাকে না, বেওয়ারিশ
সম্পত্তি হয়ে পড়ে তাই বোর্ড অফ ট্রাস্ট গঠন করা অপরিহার্য।

রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসারে বাংলাদেশের সকল মন্দির, মসজিদ, বিহার, গীর্জা
পরিচালিত হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত পরিচালনা কমিটির দ্বারা তাই রাজ
বনবিহারকে পরিচালনা করার জন্য একটি রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটি
গঠন করা অপরিহার্য বলিয়া আমি মনে করি। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা
প্রয়োজন এই বিহার পরিচালিত হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা কিন্তু
বিহার পরিচালনা কমিটির কার্যকালাপ যদি বিহার সংরক্ষণের পরিপন্থী হয়
সেক্ষেত্রে এই ট্রাস্টের বিহার পরিচালনা কমিটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার বা বাতিল
করার জন্য ভেটো প্রয়োগ করার পূর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকবে। ইহা
সংবিধান বা বাইলসের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে যাহাতে কোন প্রকার
আপত্তি উঠতে না পারে। জনগণের সম্পদ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া
অন্যকারো হস্তক্ষেপ বা অধিকার প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে অবৈধ, কারণ তাহা
রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের পরিপন্থী। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি
বৌদ্ধ বিহার পরিচালিত হচ্ছে, বিহার পরিচালনা কমিটির সংবিধান তথা
বাইলস অনুসারে। তাই অন্যান্য বিহার পরিচালনা কমিটির সংবিধান তথা
বাইলস এর সঙ্গে রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটির সংবিধান বা বাইলসের
মধ্যে বৈষম্য কিছু থাকলে তাহা সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করে
সংবিধান বা বাইলস প্রণয়ন করা একান্ত কাম্য যাহাতে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা
অনুসারে বাংলাদেশের বৃহত্তম এই রাজবন বিহারটি পরিচালিত হয় এবং
বিহারটি পাক - ভারত - বাংলাদেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে

পরিনত হয়। এক্ষেত্রে জনগণের নির্বাচিত একটি রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। যাহার রূপরেখা নিম্নে প্রদান করা হইল।

রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটির রূপরেখা :

সভাপতি : ১ জন। তিনি কমিটির প্রধান।

সাধারণ সম্পাদক বা সচিব : ১ জন। তিনি সকল সদস্যগণের সঙ্গে মিলেমিশে বিহারের সকল কাজ কর্তৃক পরিচালনা করবেন। তিনি সদস্যগণের প্রধান

সদস্য (অর্থ) : ১ জন। তিনি সকল আর্থিক দায়-দায়িত্বে থাকবেন, যথা ক্যাশ বই, পাশ বই, রসিদ বই ইত্যাদি তার দায়িত্বে থাকবে। দানবস্ত্র ও দক্ষিণার টাকা-পয়সার দায়িত্ব তার হাতে ন্যাস্ত থাকবে বটে, তবে দান বাস্ত্র ও দক্ষিণার টাকাগুণার সময় সভাপতি ও সচিব অন্য সদস্য সমন্বয়ে সেই কাজ সম্পাদিত হবে।

সদস্য (ধর্ম্মানুষ্ঠান) : ১ জন।

সদস্য (চারিদান প্রত্যয়) : ১ জন।

সদস্য (গ্রন্থ ও স্মরণিকা) : ১ জন।

সদস্য (বিনির্মাণ ও পরিকল্পনা) : ১ জন।

সদস্য (স্বাস্থ্যসেবা) : ১ জন।

সদস্য (উদ্যান) : ১ জন।

সদস্য (প্রশাসন) : ১ জন।

বিঃদ্রঃ- জ্ঞানীশুনীগণ এই বিহার পরিচালনা কমিটির পদ, বৃদ্ধি, হ্রাস প্রভৃতি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংযোজন, বিসংযোজন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে সংবিধান বা বাইলস তথা বিহার পরিচালনা বিধিমালা তৈরী করবেন।

আমি অযাচিতভাবে কেন এই প্রস্তাবনা পেশ করলাম তজ্জন্য কিছু কৈফিয়ৎ প্রদান করতে চাই।

অধুনাকালে মসজিদ, মন্দির ও গীর্জাকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে দোকান ভাড়া দেওয়া, গাড়ী ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বা হচ্ছে।

আমিও চাই রাজ বনবিহারকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য রাজ বিহারে ঢোকার পর হ্রদের পার্শ্ববর্তী স্থানে উত্তর দিকে মাঠ ও ডাঃ হিমাংশু দেওয়ান হতে ক্রয় করা সমস্ত জায়গায় কমপক্ষে ১০০০টি লিচুগাছ, ১০০০টি নারিকেল গাছ, আমড়া গাছ, জামবুরা গাছ রোপন করে আয়ের পথ প্রশস্ত করা হোক। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে উদ্যান তত্ত্ববিদ ও মাঠ কর্মীর কোন অভাব নেই।

রাজ বন বিহারের উত্তরদিকের মাঠ বিগত ৩০ (ত্রিশ) বছরের অধিককাল খালি পড়ে আছে। এভাবে খালি তথা পতিত রাখলে সরকার কর্তৃক যেকোন সময় অধিগ্রহণ করা হতে পারে। এজন্য কমপক্ষে অর্থকরী ফলের গাছ রোপণ করে জয়গাটি কাজে লাগানো উচিত মনে করি।

পূজনীয় বনভণ্ডার অনুপদিশেষ নির্বানর পর বর্তমান সময়ের ৮০/৯০ জন ভিক্ষুর চারি দান প্রত্যয় তখন কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব হইবে না। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে আগে থেকেই এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

ভবিষ্যতে এমন দিন আসা আদৌ অসম্ভব নহে, যখন অনেক লোক দল বেঁধে রাজ বনবিহারের জমি বেদখল করে ঘর বাঁধবে না। এ ব্যাপারে বাহিরের অদৃশ্য শক্তি মদদ দানের জন্য কোন প্রকার দ্বিধা করবে না- তাহা সুনিশ্চিত। বিহারের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বর্তমানই উপযুক্ত সময়। অনেক শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকা নিজ আগ্রহে নারিকেল, লেচু গাছ রোপণ করে বন বিহারকে সমৃদ্ধশালী করবেন, যদি বিহার পরিচালনা কমিটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আইনতঃ প্রতিবছর বনবিহারের আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করা প্রয়োজন। সরকার চাইলে এই হিসাব দিতে হইবে।

কোন মাস্টার প্ল্যান ছাড়া এতবড় তীর্থক্ষেত্রের দালান নির্মাণ বা কোন কিছু করা অনুচিত মনে করি, তাই পরিকল্পিত মাস্টার প্ল্যান তৈরী করার এই কামনা করে আমার প্রস্তাবনার সমাপ্তি করলাম।

সমাপ্তি